মহাকবি ভর্তৃহরি বিরচিতম্

নীতিশতকম্

[নাগরীলিপিতে মূল-টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ]

বিস্তৃত ভূমিকা সমৃদ্ধ

শ্রীঅশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদিত

সদেশ

১০১বি, বিবেকানন্দ রোড, কোলকাতা-৬

নীতিশতকের বিষয়বস্তু

শ্লোকের অন্তর্নিহিত ভাব ও বক্তব্যের ঐক্য হেতু নীতিশতকের শ্লোকসমূহকে দশটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ভাগগুলি হচ্ছে যথাক্রমে—অজ্ঞনিন্দা (বা, মূর্খপদ্ধতি), বিদ্বৎপদ্ধতি, মানশৌর্যপদ্ধতি, অর্থপদ্ধতি, দুর্জনপদ্ধতি, সুজনপদ্ধতি, পরোপকারপদ্ধতি, ধৈর্যপদ্ধতি, দৈবপদ্ধতি ও কর্মপদ্ধতি। নীতিশতকের বিষয়বস্তু এই দশটি ভাগেই বর্ণিত হলো।

অজ্ঞনিন্দা বা মূর্খপদ্ধতি (৩—১৪)

জগতে তিন প্রকার মানুষ দেখা যায়—বিজ্ঞ, অজ্ঞ এবং অল্পজ্ঞ পণ্ডিতম্মন্য। মূর্খ বলতে এখানে এই শেষোক্তদেরই বোঝানো হয়েছে। অহংবোধের দ্বারা পরিচালিত হওয়াই এদের বৈশিষ্ট্য। চেষ্টার দ্বারা মানুষ অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারে, কিন্তু

পারে না এই মূর্খদের মনোরঞ্জন করতে। যিনি সদুপদেশের দ্বারা এই মূর্খদের কুপথ থেকে সুপথে আনার চেষ্টা করেন—পরিণামে তাঁকে উপহাসের পাত্র হতে হয়।

বিদ্বৎপদ্ধতি (১৫—২৮)

বিদ্বানের সমাদর সর্বত্র, অর্থাৎ বিদ্বানকে সকলেই শ্রদ্ধা করে। রাজার-ও উচিত বিদ্বানের যোগ্য মর্যাদা দান করা। রাজার বিপুল ধন-সম্পদ থাকতে পারে, কিন্তু তা নশ্বর, পক্ষান্তরে বিদ্বানের যে 'বিদ্যা' নামক গুপ্তধন আছে তা অবিনশ্বর, এমনকি চোরেরও নাগালের বাইরে। বিদ্বানের ধন বিতরণ করলেও কমে না বরং বেড়ে চলে এবং সর্বদা তা এক অনির্বচনীয় আনন্দ দান করে। বিদ্যা বিত্তের চেয়ে প্রভাবশালী। বিদ্যাই পুরুষের (অর্থাৎ মানুষের) প্রকৃত ও শাশ্বত অলঙ্কার। স্বদেশ কিংবা বিদেশে বিদ্যাই মানুষের একমাত্র সুহৃদ, শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক। অপূর্ব কবিত্বশক্তি যার আছে রাজার রাজত্বও তারকাছে শুষ্ক তৃণবৎ তুচ্ছ বিষয়। বিদ্বানের সংস্পর্শে মানুষের কল্যাণ হয়—চিন্তা-চেতনা ও ভাষার স্বচ্ছতা আসে, পুণ্য হয়, সমাজে সম্মান বাড়ে, হৃদয়ে প্রসন্নতা আসে, যশ খ্যাতি বৃদ্ধি পায়। বিদ্বানদের অবজ্ঞা করা রাজার পক্ষে নির্বুদ্ধিতার পরিচয়।

মানশৌর্যপদ্ধতি (২৯—৩৮)

আত্মগৌরবে যারা গর্বিত এবং আত্মশক্তিতে যারা আস্থাবান তারা কোন কারণেই হীন কাজে উদ্যোগী হন না। পশুরাজ সিংহ তাদের আদর্শ। তারা এমন কাজ করেন না যার মধ্যে কোন বীরত্ব নেই। সামর্থ্যের অনুরূপ কর্মই তারা করে থাকেন এবং তদনুরূপ ফলই তাদের কাম্য। সাধারণ ফললাভে তারা তুষ্ট নন। কুকুর যেমন সাধারণ বস্তু লাভেও তৃপ্ত হয় তারা তা হন না; প্রভুর প্রতি আনুগত্যের পরাকাষ্ঠাও তারা দেখান না, কুকুর যেমন দেখায়। পরানুগ্রহে জীবন-ধারণ তাদের পক্ষে অপমানকর। সংসারে সকলেই জন্মে আবার মৃত্যুবরণও করে, কিন্তু তার জন্মই সার্থক যার দ্বারা বংশের উন্নতি সাধিত হয়, মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। যারা বীর্যবান তারা কখনও দুর্বলের উপর প্রভুত্ব দেখান না। রাহু তাই দুই তেজস্বী জ্যোতিষ্ক চন্দ্র ও সূর্যকেই গ্রাস করে, অন্য কোন দুর্বল গ্রহকে নয়। মানী ও শৌর্যবান ব্যক্তিদের মহত্ত্বের কোন শেষ নেই। ভূলোক ধারণ করা যেমন সর্পরাজের মাহাত্ম্য, সেই সর্পরাজকে পৃষ্ঠে ধারণ করে আবার তেমনি মহিমার অধিকারী হয়েছেন কূর্মরাজ। সেই কূর্মরাজকেও আবার অঙ্কে ধারণ করে অসীম ঐশ্বর্যের পরিচয় দিচ্ছেন জলনিধি।

অর্থপদ্ধতি (৩৯—৫১)

এখানে অর্থের জয়গান করা হয়েছে। বলা হয়েছে অর্থই সব কিছুর মূল। অর্থ যার নেই তার কিছুই নেই। অর্থ না থাকলে মানুষের গুণরাজিও নষ্ট হয়ে যায়। অর্থ যার আছে, সেই যেন সকল গুণের আধার; লোক সমাজে সেই সমাদৃত হয়। এই অর্থের তিন প্রকার গতি হতে পারে—দান, ভোগ কিংবা ধ্বংস। অর্থ না থাকলে মানুষের বুদ্ধি-বিপর্যয় ঘটে। রাজা যদি সন্তানের ন্যায় প্রজাদের লালন-পালন করেন তাহলে বসুন্ধরাও কল্পলতার ন্যায় ফল দান করে। রাজনীতির স্বরূপ বড় বিচিত্র। স্বার্থসিদ্ধির জন্য ক্ষণে ক্ষণে সে রূপ বদলায়। যে রাজার মধ্যে সুশাসন, যশ, ব্রাহ্মণ-পালন, দান, ভোগ এবং মিত্ররক্ষণ এই ষড়বিধগুণ বিদ্যমান তার আশ্রয়েই বাস করা উচিত। নির্দয় ধনীর কাছে অর্থলোভে দীনতা প্রকাশ করা উচিত নয়। বিধিলিপি খণ্ডন করা যায় না। যার ভাগ্যে যা লিখিত হয়েছে সে তা সর্বত্রই পাবে, তার বেশী কোথাও নয়।

দুর্জনপদ্ধতি (৫২—৬১)

দুর্জনের দুর্জনত্ব কোন কারণের অপেক্ষা করে না। দুর্জন ব্যক্তি স্বাভাবতই নির্দয় হয়ে থাকে। বিনা কারণে তারা শত্রুতা করে। তারা পরধনলোভী এবং পরস্ত্রীতে আসক্ত। সজ্জন ও আত্ম-পরিজনের প্রতি তারা ঈর্ষান্বিত হয়ে থাকে। দুর্জন ব্যক্তি যদি বিদ্যা অর্জনও করে তথাপি সে পরিহার্য, যেমন পরিহরণীয় মণিময় সর্পও। সজ্জনদের সকল প্রকার গুণের মধ্যেই দুর্জনেরা দোষ আবিষ্কার করে—এটাই তাদের স্বভাব। রাজাদের বেশীর ভাগই উগ্রক্রোধযুক্ত হয়, তাই তাদের কোন আত্মীয় থাকে না। সেবা-যত্নের দ্বারা কেউ তাদের তুষ্ট করতে পারে না। কেউ তাদের সান্নিধ্যলাভে সুখ পায় না। দুর্জনের সঙ্গে মিত্রতা যত দিন যায় ততই হ্রাস পেতে থাকে, কিন্তু সজ্জনের সঙ্গে মিত্রতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়। সজ্জনের সঙ্গে দুর্জনের শত্রুতার কোন কারণ থাকে না।

সুজনপদ্ধতি (৬২—৬৯)

সজ্জনের সমাদর সর্বত্র—সবাই তাঁদের শ্রদ্ধা করে। তাঁরা সদা সৎসঙ্গের অভিলাষী, গুণের সমঝদার এবং সংযতচিত্ত। গুরুজনদের প্রতি তাঁরা শ্রদ্ধাশীল ও বিনয়ী। বিদ্যাচর্চায় তাঁরা আসক্ত। সম্পদে-বিপদে তাঁরা ধৈর্যশীল ও ক্ষমাবান। বিদ্বৎসভায় তাঁরা বাগ্মী। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁরা পরাক্রমশীল। খ্যাতি প্রতিষ্ঠায় তাঁরা আগ্রহী। দেব-দেবীতে তাঁরা শ্রদ্ধাবান। তাঁরা যোগ্যপাত্রে দান করেন এবং সদা সত্য কথা বলেন, হৃদয় তাঁদের পূত-পবিত্র। অহিংসা, সংযম, সত্যভাষণ, দান, পরস্ত্রীবিষয়ে ঔদাসীন্য, জিতেন্দ্রিয়তা, গুরুভক্তি, দয়া এবং শাস্ত্রনিষ্ঠা—এসব হচ্ছে কল্যাণ লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। যাঁরা মহৎ তাঁদের হৃদয় বিপদে বজ্রসম কঠোর এবং সম্পদে কুসুম-কোমল থাকে। সম্পদে বা সুসময়েও

তাঁরা অবিনীত হন না। তাঁরা কখনও অন্যের আচরণের নিন্দা করেন না। মানুষের দোষ-গুণ সঙ্গপ্রভাবেই জন্মলাভ করে। এ জগতে অজস্র পুণ্যের অধিকারী ব্যক্তিই সৎপুত্র, পতিব্রতা স্ত্রী এবং কল্যাণকামী সুহৃদ লাভ করে থাকেন।

পরোপকারপদ্ধতি (৭০—৭৯)

যারা পরোপকারী সজ্জন ব্যক্তি তাঁরা বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হলেও অবিনীত হন না, বিনয় যেন তাঁদের অঙ্গভূষণ। দয়া তাঁদের পরম ধর্ম। শাস্ত্রশ্রবণ বা শাস্ত্রচর্চা, যোগ্যপাত্রে দান এবং পরোপকার—এ সব হচ্ছে তাঁদের জীবনের ব্রতস্বরূপ। তাঁদের পরোপকার স্বার্থ-বিবর্জিত। মানুষকে তাঁরা পাপকর্মে নিরুৎসাহিত এবং পুণ্যকর্মে উৎসাহিত করেন। তারা বন্ধুর গুহ্য বিষয় গোপন রাখেন, বিপদগ্রস্তকে পরিত্যাগ করেন না এবং যথাসময়ে যোগ্যপাত্রে দান করেন। সজ্জনদের বন্ধুত্ব এমন যে, একে অপরের জন্য আত্মবিসর্জনেও কুণ্ঠিত হন না। সজ্জনদের হৃদয় সমুদ্রের মতই বিস্তৃত। যারা কায়-মন-বাক্যে পবিত্র তাঁরা বিভিন্নভাবে এই পৃথিবীর সেবা করেন। কাজেই তাঁরা সকলের অনুসরণীয়।

ধৈর্যপদ্ধতি (৮০—৮৯)

'ধৈর্য' মনস্বী ব্যক্তিদের একটি প্রধান গুণ। অভীষ্ট বস্তু লাভ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা ধৈর্য ত্যাগ করেন না। ভয় বা লোভ কোন কিছুই তাঁদের লক্ষ্যভ্রষ্ট কিংবা আদর্শচ্যুত করতে পারে না। বারবার বাধাগ্রস্ত হলেও মনস্বী ব্যক্তিরা ফলপ্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত আরব্ধ কাজ পরিত্যাগ করেন না। কর্ম সম্পাদনের ব্যাপারে মনস্বী ব্যক্তিরা সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হন না; পশ্চাৎপদ হন না তাঁরা কৃচ্ছ্র সাধনেও। ধৈর্যশীল যে-মহাপুরুষ কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ ইত্যাদি জয় করেছেন প্রকারান্তরে তিনি ত্রিভুবনকেই জয় করেছেন, অর্থাৎ ত্রি-ভুবন তাঁর বশীভূত। মানুষের যত প্রকার গুণ আছে সদাচার হচ্ছে সে-সবের আকর। সদাচার মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।

দৈবপদ্ধতি (৯০—৯৮)

দৈব মানুষের নিয়ন্ত্রক, রক্ষক। দৈবের কাছে পৌরুষ নিষ্ক্রিয়। তাই দেখা যায়—অসীম ঐশ্বর্যের অধিকারী দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরাজয়ের গ্লানি বহন করতে হয়েছে। মানুষের উন্নতি-অবনতির মূলে রয়েছে এই অমোঘ দৈব শক্তি। দৈব যার প্রতিকূলে তার দুর্দশার অন্ত নেই; দৈব অনুকূল না হলে কারও জীবনে সুখ আসে না, আসে না সমৃদ্ধি। দৈবের হাত থেকে কেউ-ই অব্যাহতি পায় না। তাই দেখা যায়—দুই তেজস্বী জ্যোতিষ্ক চন্দ্র ও সূর্য পর্বে পর্বে রাহুগ্রস্ত হয়, মহাশক্তিধর হস্তী ও বিষধর সর্প বন্ধনে

আবদ্ধ হয় এবং মনস্বী ব্যক্তিরা পতিত হন কষ্টকর অবস্থায়। এ-সব প্রতিকূল দৈবেরই প্রভাব। দৈব যার কপালে যা লিখেছে তার ব্যতিক্রম হবার নয়। তৃষ্ণাতুর চাতক মেঘের কাছাকাছি থাকলেও তার কয়েকটা মাত্র বারিবিন্দুতেই তাকে তৃষ্ণা মেটাতে হয়, জীবনধারণ করতে হয়।

কর্মপদ্ধতি (৯৯—১০৮)

কর্মই সবচেয়ে শক্তিশালী, কারণ দেখা যায়—দেবতারা বিধির বশীভূত, আবার বিধি বশীভূত কর্মের। বিধি মানুষকে যে ফল দান করে তার উপর বিধির কোন নিয়ন্ত্রণ নেই—কর্মের দ্বারাই তা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই কর্মই সবার শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি দেবতা এবং চন্দ্র-সূর্যাদি মহাজ্যোতিষ্ক নিজ নিজ কর্মের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। বিষয়-বাসনা মানুষকে দুঃখ দেয়। সৎকর্মের সাধনাই মানুষের একমাত্র কর্তব্য এবং এতেই সুখ পাওয়া যায়।

বিবিধ বিষয়ক (১—৩০)